অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ থেকে বাঁচতে করণীয়

গ্রিক শব্দ অ্যানথ্রাক্স (Antharx) এর বাংলা তড়কা রোগ এবং আভিধানিক অর্থ কয়লা। এটি ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস বা ব্যাসিলাস সেরিয়াাস বায়োভার অ্যানথ্রাসিস ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট একটি সংক্রমণ। ১৮৭৫ সালে জার্মান বিজ্ঞানী রোবের্ট কচ প্রথম অ্যানথ্রাক্স এর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানান দেন। তবে তারও পূর্বে ১৭৫২ সালে বিজ্ঞানী মারেট এবং ১৭৬৯ সালে বিজ্ঞানী ফোর্নিয়ার ত্বকের অ্যানথ্রাক্সের প্রথম ক্লিনিকাল বর্ণনা দিয়েছিলেন। এর পূর্বে এটি ছিলো কেবলই ঐতিহাসিক বিবরণ। এ বিরল রোগটি মানুষের ক্ষেত্রে আফ্রিকা এবং মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় সব চেয়ে বেশি দেখা যায়। এটি মহাদেশের অন্যান্য স্থানের তুলনায় দক্ষিণ ইউরোপে বেশি দেখা যায়। উত্তর ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় এ সংক্রমণ অস্বাভাবিক। বিশ্বব্যাপী বছরে কমপক্ষে দুই হাজার টি সংক্রমণের ঘটনা ঘটে। এ সংক্রমণ সাধারণত ত্বকের সংস্পর্শ, শ্বাস- প্রশ্বাস বা অন্ত্রের শোষণের মাধ্যমে ঘটে। এ রোগে সংক্রমিত হওয়াার একদিন থেকে দুই মাসেরও বেশি সময় পরে লক্ষণগুলি পরিলক্ষিত হয়। ত্বকে একটি ছোটো ফোস্কা দেখা যায় যার চারপাশে ফোলাভাব থাকে; যা প্রায়শই কালো কেন্দ্রবিন্দুসহ ব্যথাহীন আলসারে পরিণত হয়। জ্বর, বুকে ব্যথা এবং শ্বাসকষ্ট এর অন্যতম উপসর্গ। এছাড়াও, এ সংক্রমণে ডায়রিয়া (যার মধ্যে রক্ত থাকতে পারে), পেটে ব্যথা, বমি বমি ভাব এবং বমিও হতে পারে।

প্রাথমিকভাবে, অ্যানথ্রাক্স মূলত ব্যাকটেরিয়া জনিত গবাদি পশুর একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এ রোগে আক্রান্ত পশু হঠাৎ করে মারা যায়। এরোগটি গরুর ডাকমিনা, ধাস ও ধড়াস নামেও পরিচিত। সাধারণত ক্ষুরাযুক্তপ্রাণী যেমন- গরু, ছাগল, ভেড়া ও মহিষে এ রোগ ব্যাপকভাবে দেখা যায়। গবাদিপশুতে এ রোগের মৃত্যুর হার শতভাগ। আক্রান্ত বা মৃতপশুর সংস্পর্শে আসা মানুষেরও অ্যানথ্রাক্স হওয়ার সম্ভাবনা সর্বোচ্চ। আতঙ্কের বিষয় হচ্ছে এ রোগের জীবাণু মাটিতে প্রতিকূল পরিবেশে সুপ্ত অবস্থায় ‘স্পোর’ নামক একপ্রকার প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থায় ৪০-৫০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে এবং অনুকূল পরিবেশে সক্রিয় হয়ে গবাদি পশুকে আক্রান্ত করতে পারে। তাই একবার কোথাও দেখা দিলে পরবর্তীতে বারবার সে এলাকায় এ রোগ

দেখা দিতে পারে। নিম্ন জলাভূমি, নদীর পাড় ও উপকূলীয় অঞ্চলে এর প্রকট প্রাদূর্ভাব দেখা যায়। সে হিসেবে আমাদের দেশে সাধারণত সিরাজগঞ্জ,মেহেরপুর, পাবনা,রাজবাড়ি, রাজশাহী ও টাঙ্গাইল জেলায় এ রোগটির প্রাদুর্ভাব বেশি। তবে চলতি বছরে সংক্রমণ দেখা দেয় রংপুরের বিভিন্ন উপজেলায় এবং উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুও ঘটে। গণমাধ্যমের বদৌলতে জানা যায় ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর সময়ে এ সংক্রমণে ৪৩১ জন আক্রান্ত হয়।

গ্রীষ্মের শুরূ থেকে বর্ষাকাল (মার্চ-সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত, খরা মৌসুমের পরে হঠাৎ বৃষ্টিপাত হলে এবং বন্যার পরের সময়ই সাধারণত সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ সময়কাল। সংক্রমিত পশু-খাদ্য যেমন- ঘাস, কচুরিপানা ইত্যাদি;অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত মৃত পশুকে খোলা স্থানে ফেলে রাখলে শকুন, কুকুর, শেয়াল ইত্যাদি শবাহারী প্রাণি; কখনো কখনো মাছি এবং অ্যানথাক্স আক্রান্ত মৃত পশু পঁচে-গলে মাটিতে মিশে গেলে হাড় থেকেও পশুতে এ রোগ ছড়াতে পারে। আক্রান্ত বা মৃত পশুর শ্লেষ্মা, লালা, রক্ত, মাংস, হাড়, চামড়া, পশম বা নাড়ি-ভুঁড়ির সংস্পর্শ, আক্রান্ত পশুর মাংস খাওয়া, পশুর চামড়া এবং অন্যান্য উপজাত (হাড়, দাঁত, শিং ইত্যাদি) প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে যুক্ত থাকার মাধ্যমে সাধারণত মানুষে এটি ছড়ায়। মূলত অ্যনথ্রাক্স আক্রান্ত পশুর মাংস কাটার সময় মানুষের মধ্যে অ্যানথ্রাক্স ছড়ানোর সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে। পশু জবাই করা, সেটির মাংশ কাটাকাটি করা এবং মাংস ধোয়া বা রান্নার সময় অনেকক্ষণ মাংস, রক্ত ও হান্ডির সংস্পর্কে থাকতে হয়। সে সময় আক্রান্ত পশুর রক্তের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে অ্যানথ্রাক্স। মাংস কাটাকাটির সময় মানুষের শরীরের চামড়ায় কোনো রকম ক্ষত থাকলে তার দেহে অ্যানথ্রাক্সের জীবানু প্রবেশ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আমাদের দেশে পশুর অ্যানথ্রাক্স হলেও অনেক সময় তা জবাই করে মাংস কম দামে বিক্রি করে ফেলা হয়। ঐ মাংস কাটাকাটি করার সময় অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হওয়া সম্ভাবনা থাকে। তবে পশু থেকে মানুষের মধ্যে অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ হলেও মানুষ থেকে অন্য মানুষের মধ্যে অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ হয় না।

পশুতে অ্যানথ্রাক্সের লক্ষণগুলো হচ্ছে- আক্রান্ত পশু হঠাৎ করে মারা যাওয়া,নাক, মুখ ও পায়ুসহ শরীরের বিভিন্ন ছিদ্র দিয়ে রক্তক্ষরণ এবং বের হওয়া রক্ত জমাট না বাঁধা,প্রচন্ড জ্বর (প্রায় ৪০-৪২০ সে./১০৪-১০৭০ ফা:),শরীরের লোম খাড়া হয়ে যাওয়া, জাবর কাটা বন্ধ হয়ে যাওয়া, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকা, মাংস পেশীর কম্পন,

প্রাথমিকভাবে অস্তিরতা বা উত্তেজনা কাজ করলেও পরবর্তীতে নিস্তেজ হয়ে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট ও দাঁত কটকট করা, খিঁচুনি ও কাঁপুনি, সাধারণত ২-২৪ ঘন্টার ভেতর মারা যাওয়া এবং এক দিনের বেশি বেঁচে থাকলে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় (জিহ্বা, গলা, বুক, নাভি) পানি জমে যাওয়া। পশুর দেহে মৃত্যুর পরবর্তী লক্ষণগুলোর মধ্যে মৃত পশুর পেট অস্বাভাবিকভাবে ফুলে উঠে, নাক, মুখ, প্রসাব ও মলদ্বার দিয়ে আলকাতরার মত কালো রক্ত বের হওয়া, মৃতদেহ শক্ত না হওয়া এবং অতি তাড়াতাড়ি পচন শুরু হওয়া অন্যতম। আর মানুষে অ্যানথ্রাক্স রোগটি সাধারণত তিনটি রূপে দেখা যায়। যথা-ত্বকের অ্যানথ্রাক্স, পরিপাকতন্ত্রের অ্যানথ্রাক্স ও শ্বাসতন্ত্রেও অ্যানথ্রাক্স। এর মধ্যে ত্বকের অ্যানথ্রাক্সই বেশি দেখা যায়। সাধারণত আক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে আসার ৩-১০ দিনের মধ্যে এ রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। ত্বকের অ্যানথ্রাক্সের সাধারণ লক্ষণগুলো হচ্ছে-প্রথমে চামড়ায় লালচে দাগ হয়, আক্রান্ত স্থান চুলকায় ও ফুলে উঠে, পরবর্তীতে আক্রান্ত স্থানে ১.৫-২ ইঞ্চি আকারের ফোসকা উঠে, ফোসকার মাঝখানে পচনের মত কালচে দাগ হয়ে ব্যথাহীন ঘা এর সৃষ্টি হয়; তবে সাধারণত জ্বর থাকে না।

পশুর ক্ষেত্রে অ্যানথ্রাক্স রোগের চিকিৎসায় প্রাথমিক অবস্থায় দ্বিগুণ মাত্রার পেনিসিলিন জাতীয় এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করে উপকার পাওয়া যায়। অতিতীব্র সংক্রমণের ক্ষেত্রে সাধারণত চিকিৎসার সুযোগ থাকে না। মানুষ থেকে মানুষে অ্যানথ্রাক্স ছড়ায়না, কিন্তু মানুষের শরীর এবং পোশাক অ্যানথ্রাক্স জীবাণু বহন করতে পারে। শরীর থেকে জীবাণু দূর করার জন্য ব্যাকটেরিয়া নিরোধক সাবান দিয়ে গোসল এবং গোসলের পানি ব্লিচিং বা কোনও ব্যাকটেরিয়া নিরোধক দ্বারা শোধিত করা এবং জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত জিনিসপত্র ৩০ মিনিটের অধিক সময় ধরে ফুটাতে হবে। কোনো কোনো জায়াগা থেকে জীবাণু ধ্বংসে ক্লোরিন ব্লিচিং কার্যকরী নয়; বরং এক্ষেত্রে ফরমালডিহাইড ব্যবহার করা উচিত। আক্রান্ত বাক্তির কাপড় পুড়িয়ে ফেলা জীবাণু ধ্বংসের একটি কার্যকর পদ্ধতি। মানুষ আক্রান্ত হবার পর যত দ্রুত সম্ভব অ্যানথ্রাক্স জীবাণুনাশক দিতে হবে; যত দেরি হবে জীবনের ঝুঁকি তত বাড়বে। মানুষের জন্য অ্যানথ্রাক্স টিকা প্রথম ১৯৫৪ সালে বাজারে আসে। ত্বকের অ্যানথ্রাক্স সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য অসুখ। তবে সময়মত চিকিৎসা না করালে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। সকল সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে এ রোগের চিকিৎসা করার সুযোগ রয়েছে।

ও মৃত্যু ফাঁদ হতে রক্ষা পেতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, গবাদিপশু খামারি, কসাই, ভোক্তাদের সমন্বয়ে জনসচেতনতা গড়ে তোলা উচিত।

লেখক: তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস খাগড়াছড়ি

গাংনীর গ্রামে গ্রামে অ্যানথ্রাক্স আতঙ্ক; ৯ মাসে আক্রান্ত ৪৭৫ জন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ভয়াবহভাবে ছড়িয়ে পড়েছে অ্যানথ্রাক্স। চলতি বছরের ৯ মাসে এ উপজেলায় ৪৭৫ জন আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

ফলে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে। গবাদি পশুর ভ্যাকসিন ও সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম না থাকায় অ্যানথ্রাক্স দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

জানা গেছে, গাংনী উপজেলার কাজিপুর, মটমুড়া, সাহারবাটি ও বামন্দী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের মানুষের শরীরে অ্যানথ্রাক্সের ক্ষত দেখা দিয়েছে। অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত গরু-ছাগলের মাংস থেকেই মূলত মানবদেহে ছড়িয়ে পড়ছে ব্যাকটরেরিয়াজনিত রোগের জীবাণু। গ্রাম পর্যায়ে কোন পশু আক্রান্ত হলে তা জবাই করে কম দামে বিক্রি করা হচ্ছে মাংস। কম দামে আকৃষ্ট হয়ে অনেকে ছুটে যাচ্ছেন মাংস কিনতে। আক্রান্ত পশুর মাংস কাটা এবং রান্নার সময় সাবধানতা না থাকায় অ্যানথ্রাক্স জীবাণু দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে মানবদেহে। যার ফলে শরীরের দেখা দিচ্ছে ক্ষত ঘা। প্রথমে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা করায় নিরাময় হচ্ছে না। ক্ষত স্থানের আকার বাড়ার সাথে সাথে তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ঘুরতে হচ্ছে এসব রোগীদের। অসুস্থ পশু জবাই ও বিক্রি রোধে কোন পদক্ষেপ না থাকায় আশংকাজনকহারে বাড়ছে ভুক্তভোগী মানুষের সংখ্যা।

গাংনী হাসাপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গত এক সপ্তাহে উপজেলার ৮ জন

রোগী হাসপাতালে অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন। তাদের মধ্যে দেবীপুর গ্রামের ফুলঝুড়ি, মৌসুমী, মোহাম্মদপুর গ্রামের চামেলী,ভবানীপুরের সেলিম, বালিয়াঘাটের তানিয়া, কাজীপুরের আক্কাস আলী, হাড়াভাঙ্গার কামাল হোসেন, রাইপুর গ্রামের রেখা খাতুন।

গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামের আফাজউদ্দিন জানান, তিনি বাজারে মাংসের ব্যবসা করেন। রোগাক্রান্ত গরুর মাংস নাড়াচাড়া করা কারণে তার শরীরে প্রথমে ক্ষত সৃষ্টি হয়। পরে পরীক্ষা করে অ্যানথ্যাক্স রোগ ধরা পড়ে।

একই গ্রামের আক্কাস আলী জানান, একদিন গরুর মাংস কিনে বাড়ি নিয়ে এসে পিান দিয়ে ধুয়ে দিয়েছিলাম রান্না করার জন্য। এর পরদিন থেকে শরীরে হাতে চুলকাতে শুরু করে এবং ঘায়ের মত গুটি দেখা যায়। গ্রাম্য চিকিৎসকের কাছে দেখালে তিনি বলেন অ্যানথ্রাক্স হয়েছে। পরে গাংনী হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিয়ে ওষুধ খাচ্ছি।

উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের কামাল হোসেন জানান, তিনি বাজার থেকে গরুর মাংস কিনে আনেন। সেই মাংস নাড়াচাড়া করার কারণে তার শরীরে ছোট ছোট ঘায়ের মত কি যেন দেখা যায় । পরে পরীক্ষা করে জানতে পারেন অ্যানথ্রাক্স হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিক্যাল অফিসার ফারুক হোসেন জানান, অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত হয়ে অনেকেই গ্রামে চিকিৎসা নিয়ে থাকেন। গ্রাম্য চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নিলে শরীরে ব্যাকটেরিয়ার স্পোর থেকে যায়, যা বিপদজনক। তাই এ ধরণের লক্ষণ দেখা দিলেই ঘরে চিকিৎসা না নিয়ে দ্রæত হাসপাতালে এসে চিকিৎসা নেওয়ার আহবান জানান।

গাংনী উপজেলা প্রণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোত্তালেব আলী বলেন, গবাদী পশুকে শতভাগ ভ্যাকসিনেশনের আওতায় নিয়ে আসলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব কমে যাবে। তবে জনবল সংকটের কথা বলছে প্রাণিসম্পদ বিভাগ।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাঈদ বলেন, চামড়ার পাশাপাশি ফুসফুস ও খাদ্যনালীতেও অ্যানথ্যাক্স আক্রান্ত হয়। এর ফলে মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে। সামাজিক সচেতনা তৈরির মাধ্যমে এটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে সচেতনতা কার্যক্রম চালু রয়েছে।